অস্পষ্টতার পথে
সাইদ হোসেন

অস্পষ্টতার পথে

**

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৯

Date of first edition publication: October, 2009

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© Published by Sayed Hossain

Contact Address:
Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

© Sayed Hossain 2009

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

Designed by Sayed Hossain

© Osposhtotar Pothe by Sayed Hossain.

ISBN No. 978-983-

।। ১ ।।

বাড়ি ফেরা

ওয়ারির কাছে এসে রিকশাটা ছেড়ে দিলাম । বাকিটা পথ হেঁটে ফিরবো । দশ মিনিট হাঁটলেই আমার বাসা । এখান থেকে বাসায় যেতে একটা বাড়ির উপর দিয়ে যেতে হয় । মস্ত বড় বাড়ি আর তার সামনে খোলা যায়গা । সেই যায়গায় বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে । এই পুরোনো ঢাকায় এমন খোলা জায়গা সচারচর চোখে পড়ে না । এক কালে এ বাড়ির লোকদের আবস্থা ভাল ছিল, ছিল জমিদারি এখন সে সব হারিয়ে গেছে । এখন অবহেলায় পড়ে থাকে বাড়িটা । বাড়ির নাম কুসুমবাগ । কুসুমবাগ কথাটা বাড়ির গেটে সাটানো আছে । দেখলে বোঝা যায় অনেক আগের সাইনবোর্ড । যত্ন-আত্মির অভাবে ক্ষয়ে গেছে সাইনবোর্ডটা ।

কুসুমবাগে ঢুকে একটু দাঁড়ালাম । মাথার উপরে পুরোনো গাছ, কেমন বুড়িয়ে গেছে ডালপালা । এক প্রস্ত ঠান্ডা বাতাস এসে গায়ে পড়লো । শাড়ীর আচল ভাল মতন পেচিয়ে হাঁটা দিয়েছি । একের পর এক গাছের নিচ দিয়ে এগুচ্ছি । কোন লিখিত রাস্তা নেই কিন্তু অনেকে হেঁটে পাড় হয় বলে সরু রাস্তার দাগ পড়েছে । দশ মিনিট হাঁটলেই কুসুম বাগ পেরুনো যায় তারপর রাস্তা । সেই রাস্তার মাথায় আমাদের বাসা । আমার বাবা ওখানে দোতলা বাড়ি তুলেছেন । রায়হান সাহেব বললে যে কেউ দেখিয়ে দেয় আমাদের বাড়ি ।

আমাদের বাড়িটা পুরোনো স্টাইলে বানানো । যুদ্ধের পরপরি বাবা বাড়িটা করেন । দোতলা বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে ঘেরা বারান্দা । বারান্দার সাথে ঘরগুলো লাইনধরে দাঁড়িয়ে আছে । বাড়িটা স্রেফ একটা লম্বা বাক্স । প্রতি তলায় পাঁচটা করে কক্ষ, কক্ষগুলো বেশ বড়, হাত পা ছড়িয়ে অনায়েসে থাকা যায় । আগেকার মানুষেরা অনেক জায়গা নিয়ে বাড়ি করতো । বাড়ির চারিপাশে থাকতো খোলা যায়গা, জানালা-দরজা হতো ইয়া বড় বড় । অধুনা অবশ্য সে সব পাল্টে গেছে । মূল বাড়ি ভেঙে বাড়ির

চারপাশে চারটা ফ্ল্যাট হচ্ছে । লোকসংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে জমির দাম । চারিপাশ খোলা রেখে বাড়ি করবার দিন আর নেই ।

আমাদের বাড়িতে ঢুকবার মুখে মস্ত বড় আম গাছ দাঁড়িয়ে আছে । বাবা যখন জমিটা কেনেন, তখন থেকে গাছটা আছে । এমন ভাবে বাবা বাড়ি করেছেন যেন গাছটা কাটা না পড়ে । এই গাছ বাঁচাতে গিয়ে বাবার অনেক কিছু কাটছাট করতে হয়েছে ।

বছর খানেক হলো আম-গাছটার শাখা পল্লবিত হয়ে আমাদের বারান্দায় চলে এসেছে । কতগুলো ডাল আবার বেড রুমের জানালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে । । যে কোন দিন ও ঢুকে পড়বে আমাদের ঘরে কিন্তু এরপরেও ওর গায়ে কাঁচি পড়ে না । ওকে কাটতে গেলে কোথায় যেন আমরা আতকে উঠি ।

যখন আম পাকতে শুরু করে, তখন হাত বাড়িয়ে আম পাড়ি তবে সমস্যা একটাই আর তা হলো গাছ বেয়ে যে কেউ উঠে আসতে পারে আমাদের বারান্দায় । সেজন্য বাবা বারান্দার ডালে জালি দিয়ে দিয়েছেন যেন কেউ বেয়ে না উঠতে পারে । আমরা গাছটার নাম দিয়েছি উদয় কারণ সকালে ঘুম ভেঙে প্রথম আমরা উদয় কে দেখি । এই পুরোনো ঢাকায় সূর্য উদয় দেখবার কোন সুযোগ নেই তাই উদয় কে দেখে আমরা স্বাদ পূরণ করি ।

যখন খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়, তখন উদয়ের দাপাদাপি দেখবার মতন । আমাদের জানালায় বার বার ঝাপটা দিয়ে যায় ও । বাবা এসে জানালা চাপিয়ে দেন তারপর কাচের ফাঁক গলিয়ে আমরা উদয়ের দাপাদাপি দেখি । শান্ত উদয় কেমন অশান্ত হয়ে উঠছে । খুব অচেনা মনে হয় তখন উদয়কে ।

বাড়ির কাছে এসে দেখলাম বিরাট জটলা । লোকজন ভিড় করে কি যেন দেখছে । পুরোনো ঢাকায় জটলা পাকানো নূতন কিছু নয় কারণ এখানকার লোকদের বড় একটা অংশ বেকার । ছোটখাট কোন ব্যাপারে ওরা দাঁড়িয়ে যায় যতক্ষণ না ব্যাপারটা ফায়সালা হচ্ছে । মেয়ে মানুষ বলে ভিড় ঠেলে দেখতে পারলাম না তবে আন্দাজ করলাম কেউর কিছু খোয়া গেছে তাই নিয়ে দয়-দরবার ।

ভিড়-ভাট্টায় না গিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম । তাকিয়ে দেখলাম ধ্যান-গম্ভীর উদয় দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে । ওর নিচে কতগুলো কাগজের টুকরো, ওগুলো তুলে ডাস্টবিনে ফেলে ঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছি । ঘরে ঢুকে দেখি খুশি বসে আছে আর এ পাশে হাসু চাচা । বুঝলাম ওদের পরামর্শ চলছে নূতন প্রজেক্ট নিয়ে । খুশি আমার ছোট বোন, থার্ড ইয়ারে পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে । ওকে ঘিরে আমাদের সব স্বপ্ন, সব আশা । সে কথা পরে আবারও লিখছি ।

।। ২ ।।

আমার অফিস

মতিঝিলে আমার অফিস । একটি দৈনিক পত্রিকাতে চাকরি করি । বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশ দিয়ে এগুলে অফিসটা চোখে পড়ে । পত্রিকায় শিশু-কিশোর পাতা আছে, সেখানে সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছি । শিশু-কিশোরদের ছোট ছোট লেখা আর ড্রইং দিয়ে সাজিয়েছি শিশু-কিশোর পাতা । পত্রিকার মালিকেরা এক পাতা ছেড়েছেন শিশু-কিশোরদের জন্য । সপ্তাহে দুদিন শিশু-কিশোর পাতা বের হয় । ছোট ছোট বাচ্চারা সব সময়ে লেখা পাঠায় ।

একবার এক মেয়ে লিখলো, সম্পাদক আপা, ছালাম নেবেন । আমি সব সময়ে শিশু-কিশোর পাতা পড়ি । আমার আঁকা ড্রইং পাঠালাম । খুব খুশি হবো যদি ছাপেন । ইতি, সায়মা, লিটল কিন্ডারগার্টেন স্কুল, গোপিবাগ ।

আরেকজন লিখলো, আপা, ছড়া পাঠালাম । আপনি যদি না ছাপেন আপনার পত্রিকা আর পড়বো না । ইতি, নাতাশা, লক্ষ্মীবাজার কিন্ডারগার্টেন সকুল, ঢাকা ।

আরেকজন লিখলো, আপা, আপনি খুব ভাল কারণ আপনি আমার ছড়া ছেপেছেন ।

আমি ছদ্মনামে সম্পাদকীয়তে লিখি । নাম নিয়েছি রঙধনু । মাঝে মধ্যে দেখি গার্জিয়ানরা বাচ্চা নিয়ে হাজির হয় আমার অফিসে । ওরা বলে, আমাদের বাচ্চারা দেখতে চায় রঙধনু নামে কেউ আছে কিনা । আমি বলি, আমি রঙধনু । তখন একজন বললো, আমি ভেবেছি তুমি একজন ছেলে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমে মাস্টার্স করেছি তারপর এই চাকরিটা পেয়ে যাই । প্রথমে সহকারী সম্পাদক হিসেবে ঢুকি তারপর সম্পাদক সাহেব অন্যত্র গেলে রীতিমত সম্পাদক বনে যাই । ছোটবেলা থেকে শিশু-সাহিত্য ভাল লাগে তাই শিশু-সাহিত্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি ।

লরা ইনগেলস ওয়াইল্ডের লিটিল হাউস পড়েছি খুব মন দিয়ে । একটা গ্রামীণ পরিবারের হাসি-কান্না নিয়ে লিখেছে লরা । লিটিল হাউস আসলে লরার-ই আত্ম-জীবনী । ধাপে ধাপে লরা লিখে গেছে তার জীবন কাহিনী । এই লরাকে নিয়ে কিছু না লিখে স্বস্তি পাচ্ছি না । মার্কিন যুক্তরাজ্যের উইনকনসিনে জন্মগ্রহন করেন লরা ১৮৬৭ সালে । বেঁচে ছিলেন দীর্ঘদিন কিন্তু উনি যে এত ভাল লিখতে পারেন সেটা বুঝতে পারেন ষাটের কোঠা পেরুবার পর । শুরু হয় তার লেখা, অল্প কদিনে নাম কুড়িয়ে নেন এই ভদ্রমহিলা ।

তারপর পড়েছি রাশিয়ানদের বুদ্ধি খাটাও মাশা । এমন এমন বুদ্ধি আটে মাশা যে খুব মজা লাগে । কি সুন্দর ছবি দিয়ে গল্পগুলো লিখেছে ওরা । এখন ওসব অনেক পুরোনো হয়ে গেছে তারপরেও পড়তে ভাল লাগে । আধুনিক যুগে পড়ি হ্যারি পোর্টার । ইয়া মোটা বই কিন্তু দারুণ লাগে পড়তে ।

।। ৩ ।।

ছেলেবেলা

ওয়ারি এলাকাটা একেবারে পুরোনো ঢাকায় পড়েছে । এপাশে টিপু সুলতান রোড, ওদিকে হাটখোলা, এই হাটখোলাতেই রয়েছে কামরুন্নেসা স্কুল । এই কামরুন্নেছাতে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি । প্রতিদিন লাল জামা পড়ে নেমে আসতাম তারপর বাবা সকুল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিত । বিকেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে বাবাকে খুঁজতাম । দেখতাম ঠিক ঠিক বাবা দাঁড়িয়ে আছে সকুলের গেটে ।

- হাসি, কিছু খাবি ?
আমি আইসক্রিম দেখিয়ে দিতাম । বাবা কিনে দিত আমার হাতে ।

আইসক্রিম খেতে খেতে বাড়ির দিকে হাঁটা দিতাম । আমার সকুল ব্যাগটা কাধে নিয়ে বাবা হেঁটে চলতো আমার সাথে । মাঝে-মধ্যে রিকশায় চড়ে বসতাম । তখন শহরে ভিড় কম ছিল । হাঁটা পথ বা রিকশা কোনটাই অসুখকর ছিল না ।

বাসায় এসে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসতাম । বাবাই সব বেড়ে দিত আর হাসু চাচা দাঁড়িয়ে থাকতো । আমি খেয়ে চলতাম আর ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো ।

হাসু চাচা আমাদের সাথে আছে আমাদের ছোটবেলা থেকে । বয়স প্রায় বাবার সমান বা বেশিও হতে পারে কিন্তু গায়ে গতরে অনেক শক্তি রাখে । হাসু চাচা আমাদের সাথে থাকলে কেউ এগুতে সাহস করে না । আমাদের জন্য সব করতে পারে হাসু চাচা ।

খুশি আমার ছোট বোন । ও তখনো সকুলে যায় না তবে যাবে যাবে করছে । বাবা চাইছেন বছর ঘুরলে ওকে ভর্তি করিয়ে দেবে । আমরা দুই বোন সকুলে যাব, মনে হতেই ভাল লাগতো কিন্তু আমাদের অনুভূতিগুলো আমাদের মার সাথে শেয়ার করতে পারতাম না কারণ আমার জন্মের আট বছর পর মারা যান আমাদের মা তাই মায়ের আদর থেকে বার বার বন্চিত হয়েছি আমরা ।

সকুল ছুটির পরে দেখি মা'রা দাঁড়িয়ে আছে সকুল গেটে । আমার বন্ধুরা ঝাপিয়ে পড়ে মার কোলে তারপর মার হাত ধরে হাঁটা দেয় । মাঝে-মধ্যে পেছন ফিরে হাত নাড়ে, আমিও হাত বাড়িয়ে দেই । তখন অভিমানে মনটা গুমরে উঠে । মার উপর খুব রাগ হয়, সকুলে ঢুকে তখন অনেকক্ষণ কাঁদি ।

- খুকি কাঁদছো কেন? আমাদের আয়া এসে বলে ।
- কৈ না তো?
- তোমার বাবা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ।
- ঠিক আছে চলো, এই বলে আয়ার হাত ধরে সকুলের বাইরে আসি ।

বাবা এসে জড়িয়ে ধরেন । তখন বাবার কোলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ থাকি । বাবা কিছু বলে না, চুপ করে বসে থাকেন যতক্ষণ না আমি মাথা তুলছি ।

এভাবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত মার অভাবে কেঁদে কেঁদে ফিরেছি তারপর আস্তে আস্তে সয়ে গেছে । এখন আমরা বড় হয়েছি, আমাদের সহ্য ক্ষমতাও বেড়েছে । তবে যাদের মা নেই, তাদের জন্য কিছু করতে চাই আমরা । মা নেই এমন কেউ সাহায্যের জন্য এলে বাবা তাকে ফিরিয়ে দেন না । একটা না একটা গতি করেন তার জন্য ।

মা হারিয়ে আমি যে অসহায়ত্বের মধ্যে পড়েছি, সে কষ্টের ভাগ খুশিকে দিতে চাই না । ওকে আমরা সব সময় আগলে রাখি । ওর আব্দারটা সবার আগে কিন্তু সমস্যা হলো ওর কোন আব্দার নেই । কি ঈদ, কি জন্মদিন কখনো ওর কিছু চাইবার নেই । একা একা ঘুরে বেড়ায় মেয়েটা, কখনো ছাদে, কখনো বারান্দায় আবার দেখি উদয়ের নিচে বসে আছে পাটি পেড়ে । আমি আর বাবা গিয়ে ওর জামা-কাপড় কিনে আনি । বললে পড়ে না বললে ওভাবে চলে যায় ওর দিন ।

খুশি আমাকে আদর করে আপা না বলে আপি ডাকে । আমারও ভাল লাগে আপি শুনতে । আমি কিছু বলি না ।

একবার বললো, আপি, তুমি বড় হয়ে কি হবে?

- পত্রিকায় কাজ করবো । ছোটদের সাহিত্য লিখবো । তুই?

- গাছ-পালার মা হবো তারপর ওদের পালবো । আমার বাড়ি এলে দেখবে কেমন গাছ-পালা ।

আমি বললাম, গাছ-পালার মা হবি মানে কি?

- গাছ-পালার মা হবো মানে আমি ওদের দুঃখের কথা শুনবো তারপর সে সব দুঃখ ঘুচাবো ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

খুশি তখন ক্লাস এইটে পড়ে, আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি কেবল । ওর চেয়ে বছর চারেক বড় হবো আমি । খুশিকে দেখি সব সময় গাছ পালা নিয়ে থাকে । ওর ঘরের কার্নিশে, টি-পটে ছোট ছোট গাছ ঝুলে থাকে । ওগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে ও । ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো উদয় যে কিনা বাড়ির মুখে মাথা উঁচিয়ে আছে ।

একদিন খুশি বললো, আপি, মা কি পর্যন্ত পড়েছেন ?

- কলেজ ।

- আর পড়েননি কেন?

- কারণ কলেজ পাস করবার পর মার বিয়ে হয়ে যায় ।

- বিয়ের পর কি পড়া যায় না ?

- হু যায় কিন্তু অনেকে পড়ে না ।

- তুমি কবে বিয়ে করবে আপি?

- কেন?

- বিয়ে করলে তো তুমি চলে যাবে তখন আমি কার কাছে থাকবো ?

- আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না, এই বলে খুশিকে কাছে টেনে নেই ।

খুশি কিছু বলে না । আমার গলা জড়িয়ে ধরে । ওর যে মা নেই, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠে ।

।। ৪ ।।

খুশির বাগান

আমার ছোট বোন খুশি । এবার থার্ড ইয়ারে পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে । দেখতে দেখতে সকুল-কলেজ পেরিয়ে ইউনিভাসিটিতে ঢুকলো ও । ছোটবেলা থেকে গাছ-পালা নিয়ে থাকে, তাই বোটানি ডিপার্টমেন্টে নাম লিখিয়েছে । খুশি শুধু গাছ-পালার বই পড়ে না, ওদের সাথে ওর নিবিড় সখ্যতা । কত রকমের গাছ যে আছে আমাদের বাসায়, তার হিসেব শুধু খুশিই জানে । ক্লাসে যাবার আগে একবার দেখে যায় তারপর ফিরে এসে ওদের নিয়ে বসে । এভাবে বিকেলটা কাটে গাছ-গাছালি নিয়ে তারপর মাগরিবের আজান দিলে ঘরে এসে বসে ।

গাছপালা নিয়ে ওর আগ্রহ দেখে তিন-তালার ছাদটা ঘিরে দিয়েছে আমাদের বাবা যেন খুশি বাগান করতে পারে । সেই ছাদে খুশি থাকে তার গাছপালা নিয়ে । মাঝে-সাঝে বাবা গিয়ে হাজির হয় তারপর খুশি আর বাবা মিলে বাগান করে ।

তিনতলা ছাদের কিছুটা অংশ কাচের আচ্ছাদনে ঢাকা আর বাকিটা উন্মুক্ত যেন সূর্যের আলো ঠিক ঠিক পড়তে পারে । অনেক গাছের সামান্য আলো হলে হয় আবার অনেকের দরকার অনেক আলো । সেটা মাথা রেখেই ছাদের আচ্ছাদন করা হয়েছে । জায়গায় জায়গায় ছিকা ঝোলানো হয়েছে যেন কিছু গাছ ঝুলিয়ে রাখা যায় । যেহেতু পুরো তিনতলার ছাদটা খুশির তদারকিতে চলে তাই এর নাম হয়েছে খুশির বাগান । দিনভর খুশি থাকে ওখানে ।

গাছ-গাছালির পাশাপাশি বাগানে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এদিকে কতগুলো চেয়ার, পাঁচ-ছয়জন অনায়েসে বসতে পারবে । প্রায়ই বসে গল্প করি আমরা । মাঝে-মধ্যে হাসু চাচা এসে যোগ দেয় । খুশির প্রধান সহায়ক হলো হাসু চাচা । এই হাসু চাচাকে নিয়ে খুশির অভিযান চলে অজানা গাছের খোঁজে ।

খুশির প্রধান কাজ হলো অজানা গাছের খোঁজে ছুটে বেড়ানো । খুশির বাগানে যেসব গাছ আছে ওগুলো দূর্লভ ধরনের, সচারচর চোখে পড়ে না । ছবির কাজ হলো নূতন নূতন গাছ খুঁজে বেরানো তারপর দেশি-বিদেশী মিউজিয়ামে সেসব সরবরাহ করা । প্রতিটি গাছের বোটানিক্যাল নাম আছে যদিও আমরা নিত্যদিনের কাজে সে সব ব্যবহার করি না । আমরা সকাল-বিকেল আম বললেও বোটানিস্টরা বলবে Mangifera indica তারপর পিয়াজকে বলবে Allium cepa । সবাইরি একটা জগত আছে, সে জগতে খুশিরা ঘুরে বেড়ায় ।

নূতন গাছ খোঁজার পাশাপাশি খুশির আরো একটা টার্গেট হলো ক্যানসারের প্রতিষেধক খুঁজে বের করা । Borneo অন্চলের গহীনে এক বা একাধিক গাছ থেকে তৈরি হতে পারে ক্যানসারের ঔষধ । সেই লক্ষ্যে খুশি প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু ও এখানো অনেক ছোট । যখন বড় হবে, তখন এ প্রজেক্ট হাতে নেবে । ওর মতন উদ্যমী, পড়ুয়া মেয়ের জন্য Borneo অভিযান খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা হবে না ।

আমাদের মা যখন মারা যান, তখন আমরা অনেক ছোট । হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে সকুলে যাই । যখন আমাদের মাতৃস্নেহে সিক্ত হবার কথা, ঠিক তখনি আমাদের মা মারা যান । এর মূলে আছে ক্যান্সার আর তাই ক্যান্সারকে আমরা ব্যক্তিগত শত্রু মনে করি । যখন খুশি বললো এই শত্রুকে পরাভূত করবার ঔষধ Borneo অন্চলে জুটবে, তখনি আমরা উঠে পড়ে লেগে গেলাম ।

প্রথমেই বাবা খুশির বাগান নামে ব্যাংক একাউন্ট খুললেন এবং নগদ পাঁচ লাখ টাকা জমা দিলেন । আমি আমার জমানো টাকা থেকে এক লাখ দিলাম । এভাবে শুরু হলো খুশির বাগান একাউন্ট । এখন প্রতিমাসে বাবা টাকা রাখে একাউন্টে । আমার বেতনের দশ-ভাগ আপনা-আপনি চলে যায় এই একাউন্টে কারণ সে ভাবেই ব্যাংককে বলে রাখা হয়েছে ।

Borneo অভিযানে চাই অনেক টাকা, অনেক শক্তি, তাই খোলা হয়েছে এই একাউন্ট । খুশি বড় হলে শুরু হবে অভিযান তারপর বের হয়ে আসবে ক্যানসারে ঘাতক ফলে আমাদের মতন মাতৃহীন অবস্থায় কাউকে পড়তে হবে না ।

।। ৫ ।।

আনিছ

নিউমার্কেটে এসেছি বই কিনতে । শিশু-কিশোরদের বই কিনবো ।

মনা পাবলিশার্সে ঢুকেছি । সারি সারি লাইন দিয়ে বইয়ের সেলফ, বই দেখে দেখে এগুচ্ছি । এদিকে এসে দেখলাম আনিছ দাঁড়িয়ে আছে । মাথাটা ঝুঁকে আছে বইয়ের দিকে ।

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে । একটু কাশি দিতেই আনিছ মাথা তুলালো ।

- এই হাসি, তুমি কোত্থেকে ?

- এদিকে এসেছিলাম । ভাবলাম বই নিয়ে যাই ।

- তো....কি কি কিনলে ?

- না এখনো কিনি নি, তুমি?

আনিছ বললো, এই বইটা নিলাম, বলে একটা বিদেশী ইংরেজি বই মেলে ধরলো ।

আমি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলাম । পাতা উল্টাতেই নূতন আনকোরা গন্ধ নাকে এলো । বিদেশী বইয়ের গন্ধই আলাদা, কেমন আষটে ধান পাকার গন্ধ ।

- পড়বে ? চাইলে হাওলাত নিতে পার ।

আমি বললাম, এত কঠিক কঠিন ইংরেজি আমি বুঝবো না । তোমার কাছেই রাখ ।

- কি যে বল তুমি । চাইলেই পড়তে পারবে ।

- না । অত ছোট ছোট লেখা আমার মাথায় ঢুকবে না আর তাছাড়া এসব আমি পড়ি না । আমার পছন্দ ....

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আনিছ বলে উঠলো, কিশোর গোয়েন্দা, হ্যারি পোর্টার, লরা ইনগেলস ওয়াইল্ড, বুদ্ধি খাটাও মাশা ।

আমি হেসে দিলাম, কিছু বললাম না ।

আনিছরা আমাদের পাড়াতেই থাকে । গলির শেষ মাথায় আনিছদের বাসা । আমার চেয়ে বছর দেড়েক বড় হবে ও । ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি পড়ায় বছর খানেক হলো । দেখতে শ্যামলা, মাথা ভর্তি চুল । মাথার চুল লম্বা হয়ে কানের উপর ঝুলে আছে যাকে আমরা বাবরি বলি । ও যখন হাঁটে, তখন ওগুলো দুলে দুলে চলে ওর সাথে । আমি পেছন থেকে ওর বাবরি দোলা দেখি । কিন্তু আমার যে ওর বাবরি দোলা ভাল লাগে, সে কথা কখনো বলি নি । ছোটবেলায় যখন এক সাথে খেলতাম, তখন সব বলতাম, এখন সংকোচ লাগে । আমরা যে বড় হয়েছি, সব কথা যে বলা যাবে না, সে কথা বুঝতে পারি ।

আনিছ বললো, কোক খাবে হাসি ?

- চল খাই, আমি অলোস ভাবে বললাম ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কোকের দোকানে এলাম । কাচে ঘেরা দোকান, ভেতরে এয়ারকন্ডিশন চলছে । দেখতে দেখতে কোক এলো । কেবলি ফ্রিজ থেকে নামিয়েছে ওরা । বোতলের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি লেগে আছে ।

আনিছ বললো, তারপর আজ অফিস যাওনি?

- না । আজ ছুটি নিয়েছি ।

- কেন ?

আমি হেসে বললাম,

ছুটি নিতে অসুবিধে কোথায়? ছুটিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল । ভাবলাম ছুটি নেই, দু-একদিন ঘুরে বেড়াই ।

- আজ তো বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরলে । কাল কি প্ল্যান ?

আমি বললাম, কোন প্ল্যান নেই । কাল সকালে ঠিক করবো কি করা যায় ।

- আমি একটা প্ল্যান দেই ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

আনিছ বলতে লাগলো,

অলিয়াস ফ্রসেসে আর্টের প্রদর্শনী হচ্ছে হিচকক হারলিনের । এত সুন্দর করে এঁকেছেন ভদ্রলোক তুমি না দেখলে বিশ্বেস করবে না । ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে । কেউ কোন প্রশ্ন করলে সাথে সাথে জবাব দেয় । কাল সকাল সকাল চলে যেও । বিকেলে আবার ফরাসি সিনেমা দেখাবে । ও

ভাল কথা, হিচকক হারলিন হ্যারি পোর্টারের একটা স্কেচ করেছে । ঘরে ঢুকতে ডান দিকের দেয়ালে দেখতে পাবে ।

আমি বললাম, তুমি কি আসছো?

- না । কাল সারাদিন আমার লেকচার ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে রইলাম ।

আনিছের কাজ হলো সারাদিন লেখাপড়া করা । ইংরেজি সাহিত্যের সব কিছু ওর পড়া । এখানে খুশি আর আনিছের অনেক মিল । আনিছ যেমন নীলক্ষেতে পুরোনো বই খুঁজে বেড়ায়, তখন খুশি গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়ায় নূতন গাছের খোঁজে । কেউ কোন গাছের সন্ধান দিলে খুশি ছুটে যায় তারপর নিয়ে আসে সেই গাছ আমাদের ছাদ-ঘরে ।

@ Sayed Hossain 2009

।। ৬ ।।

রাতের আড্ডা

একদম ঘুম আসছে না । এপাশ-ওপাশ করছি । ঘড়িতে রাত দুটোর ঘন্টা দিল । ভাগ্যিস কাল অফিস নেই, দেরিতে উঠলে কোন অসুবিধে দেখছি না । শুয়ে শুয়ে গড়াগড়ির চেয়ে নামাজ পড়লে কেমন হয়? যেমনি মনে হওয়া তেমনি ঝাপিয়ে পড়া ।

নামাজ পড়তে আমি পছন্দ করি । সুযোগ পেলে নামাজে দাঁড়িয়ে যাই । এই রাত-বিরেতে সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না । সুন্দর করে ওজু করে তাহাজ্জুতে দাঁড়িয়েছি । খুব ছোট নামাজ তাহাজ্জুত, দুই রাকাতে শেষ হয়ে আসে । বড় একটা সুরা দিয়ে শুরু করলাম যেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় । নামাজ শেষে খুশির কথা মনে হলো । দরজার এপাশ থেকে উকি মেরে দেখি ঘুমাচ্ছে মেয়েটা । মনে হলো খুদা ঠিক ঠিক সাহায্য করবে খুশিকে যেন ও দাঁড়াতে পারে জীবনে । কত বন বাদারে ঘুরে বেড়ায় মেয়েটা ।

একদিন খুশি এসে বললো, আপি, তুই নামাজ পড়ে খুদার কাছে কি কি চাস?
আমি বললাম, কি চাইবো ? কিছুই চাই না । নামাজ পড়ে অন্য কাজে মন দেই ।
- কেন ? চাইলে তো পারিস ?
আমি বললাম,

প্রয়োজন নেই কারণ খুদা জানেন আমি কি চাই । অযথা উনাকা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখি না ।

খুশি একটু চুপ থেকে বললো, খুদা কি আমাদের মতন না অন্য কিছু?
- সে আমি কিভাবে বলবো ? খুদা খুদার মতন ।
খুশি চাপাচাপি শুরু করলো, বল না আপি, খুদা কার মতন?
আমি বললাম, খুদা কার মতন তা আমি জানি না তবে খুদার সাথে আমাদের অনেক মিল ।

- যেমন, খুশি মাথা ঝুঁকিয়ে জানতে চাইলো ।

- যেমন ধর, আমাদের রাগ আছে, ভাল লাগা আছে, অপছন্দ আছে খুদারও তাই আছে । নিজেদেরকে প্রকাশ করবার জন্য আমরা দৌড়ঝাপ পাড়ি, সকাল-বিকেল অফিস করি, খুদাও জগত বানিয়েছেন নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য ।

- আর কি কি অমিল? খুশি একটু থেমে জানতে চাইলো ।

- মানুষ সসীম আর খুদা আসীম । মানুষের আদি আছে, সম্বভত অন্তও আছে কিন্তু খুদার সে সবের বালাই নেই । তিনি অনাদি-অনন্ত ।

খুশি একটু থেমে বললো,

তোর নামাজের বাহার দেখে আমি আর বাবা আফসোস করি । তোর মতন নামাজী হতে পারলাম না ।

- তার দরকার নেই । এখন যেমন আছিস তেমনি থাক ।

- সেটা কি রকম?

আমি বললাম, ক্যানসারের ঔষধ আবিস্কার কর, সেটা হাজার ইবাদতের চেয়ে উত্তম হবে ।

খুশি আর কথা বাড়ালো না । একটু চুপ থেকে কাজে চলে গেল ।

এক কাপ সরবত বানালাম লেবু দিয়ে, এর সাথে চিনি গুলিয়ে দিয়েছি । দু- একটা বরফের কুচি ছেড়ে দিলাম ওর মধ্যে । ঠান্ডা প্রাণময় সরবত দাঁড়িয়ে গেল একটা । সেই সরবত নিয়ে তর তর সিরি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছি । ছাদে উঠবার সিড়িটা সিড়ি ঘর দিয়ে না করে আমাদের বসার ঘর থেকে স্টিলের মই দিয়ে করেছেন আমাদের বাবা যেন আমরা ছাড়া কেউ ছাদে উঠতে না পারে ।

ছাদে উঠতেই পূণিমার আলো এসে পড়লো । তাকিয়ে দেখলাম সারাটা ছাদ থিক থিক করছে চাঁদের আলোতে । দক্ষিণের বাতাস এসে পড়লো আমার গায়ে ।

ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাটে আলো-হাওয়ার খোঁজ পাওয়া যায় না । চারিদিকে গিজ গিজ করে গাড়ি । একটু পর পর বাস এসে দাঁড়ায় তারপর ছাড়তে থাকে ধুয়া । ধুমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চারিপাশ । আমাদের এই ঢাকা শহরে আলো হাওয়ার জায়গা বলতে বাসা-বাড়ির ছাদ । তাই শহরের লোকজন ছাদে উঠে আসে আলো-হাওয়ার খোঁজে ।

খুশির বাগানে সব সময় চেয়ার পাতা থাকে । সেখানে খুশি বিশ্রাম নেয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে । আমরাও এসে বসি । কাঠালের কাঠ দিয়ে বাসায় মিস্ত্রি ডেকে চেয়ারগুলো বানানো হয়েছে । শক্ত মজবুত বাধন দেয়া হয়েছে চেয়ারের পাটাতনে যেন ভাড়ি কোন মানুষ বা বস্তু অনায়েসে চাপিয়ে দেয়া যায় এর উপরে ।

সরবত নিয়ে চেয়ারে বসে গেছি । সুর সুর করে চুমুক দিচ্ছি গ্লাসে । তাকিয়ে দেখি চাঁদের আলোতে আমার ছায়া পড়েছে ছাদের মেঝেতে । আমি নড়লে ছায়াটাও আমার সাথে নড়ে । আশে-পাশের ছাদে কোন মানুষ নেই, সবাই দরজা আটকিয়ে শুয়েছে । ডান দিকে আনিছদের ছাদ, আমার বাড়ি থেকে পাঁচ-ছটা বাড়ি পড়ে আনিছদের বাসা ।

আনিছের আবার রাত জাগার বাতিক আছে তাই মাঝে-মধ্যে দেখি রাত-বিরেতে ঘুর ঘুর করে ছেলেটা ছাদের চারিধার । চা-কফি নিয়ে বসে তারপর রাত পোহালে সুর সুর করে নিচে নেমে আসে ।

ছেলেবেলায় একটা গুড্ডি এসে পড়েছিলো আমাদের পাড়ার লাইটপোস্টে । তখন আমি ক্লাস থ্রি তে পড়ি, আনিছ ফাইবে । গুড্ডিটা ঠেকেছে লাইটপোস্টের মাথায় কিন্তু ওর সুতো ঝুলে আছে অনেক নিচে । আনিছ বার বার চেষ্টা করে নাগাল পাচ্ছিল না ।
আমাকে বললো, হাসি, আমার কাধে উঠ তো ।
আমি তর তর করে উঠে গেলাম তারপর সুতো টেনে গুড্ডিটা নামিয়ে আনলাম ।
আনিছ খুব খুশি হলো । বললো, চল, ছাদে গিয়ে উড়াই ।
আমরা ছাদে গিয়ে গুড্ডি উড়িয়ে দিলাম ।

এই গল্পটা মনে হতেই হাসি পেল কিন্তু হাসলাম না । মাথা ঝুকিয়ে দেখলাম লাইটপোস্টটা এখনো আছে কিন্তু কেমন জং ধরে গেছে । এই অস্পষ্ট আলোতে ওকে খুব অচেনা মনে হলো । সবচেয়ে মজার কথা, এই যে এতটা বছর পার হয়ে গেছে, এই যে আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছি, এই যে এত পরিবর্তন কিন্তু আমাদের আনিছের কোন পরিবর্তন নেই । এখনো সে গুড্ডি উড়ায় তবে কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে চিলেকোঠার আড়াল থেকে উড়ায় । কেউ বুঝুক বা না বুঝুক আমি জানি এই গুড্ডির নাটাইটা এখন আনিছের হাতে । আমি জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না,

এরিয়ে যায় অথবা হাসে । সম্ভবত মানুষ তার বেসিক চেন্জ করতে পারে না । বেসিক স্বভাবগুলো থেকে যায় সারা জীবনের জন্য ।

- হাসি কি করছিস ?

তাকিয়ে দেখি বাবা উঠে এসেছে ছাদে ।

আমি বললাম, কি হলো তোমার? এই রাত-বিরেতে এখানে?

- ঘুম আসছে না ?

- কেন?

বাবা হেসে বললেন, সম্ভবত বদ হজম হয়েছে তাই ঘুম আসছে না ।

- কি করে হলো ?

- গতকাল টিপু সুলতান রোডে পুড়ি কিনে খেয়েছিলাম তারপর থেকে ফুটফাট শুরু হয়েছে পেটে ।

আমি বললাম, দাঁড়াও তোমাকে বেলের সরবত করে দেই ।

- এই রাত বিরেতে বেল পাবি কই?

- আছে । একটু বসো ।

বদ হজম হওয়াটা নূতন কিছু নয় বাবার । বাইরের ভাজা-পোড়া জিনিষ পেটে পড়লে বাবার পেট ভার হয়ে আসে তারপর দুই-তিন দিন টয়লেট বন্ধ । সে- কদিন বাবা ঠিক মত ঘুমাতে পারে না । এপাশ-ওপাশ করে তারপর দিন কতেক গেলে আপনাতেই সব ঠিক হয়ে আসে । আসলে সবাই সব কিছু হজম করতে পারে না । অনেকে লোহা খেয়ে হজম করে ফেলে আবার অনেকে সামান্য অনিয়মে কাহিল হয়ে পড়ে । আমার বাবা সেই দলে কিন্তু বাবাকে বোঝানে যাবে না সে কথা । বাইরের লুচি, পুড়ি, সিঙারা আর হালিম বাবার প্রিয় খাদ্য । যখনি এসব পেটে পড়েছে, বাবার বদহজমের পালা শুরু হয়েছে ।

তবে বাবা যে কাজটি নিয়মিত করেন আর তা হলো খুশির ছাদে গিয়ে প্রতিদিন কিছু না কিছু উঠ-বস করেন । ঘামে ভিজে আসে বাবার সবকিছু তারপর নিচে নেমে আসে বিশ্রাম নিতে । বাবার স্বাস্থ্য এখনো ভাল, তেমন অসুখ-বিসুখ কখনো চোখে পড়েনি ।

বাবার জন্য বেলের সরবত করে আনলাম । সরবতের ভেতর ঠান্ডা বরফের কুচি দেয়া ।

বাবা বললেন, তুই খাবি না ?

আমি লেবুর সরবতটা দেখিয়ে দিলাম । বাবা চুপ হয়ে গেলেন ।

আমি বললাম,

তোমাকে কত দিন বলেছি বাইরের জিনিষ খাবে না । মাঝে-মধ্যেই তো বদ হজমে পড়ো । এছাড়া এগুলো ভেজালে ভরা, এসব খেয়ে খেয়ে আমাদের আয়ু কমে আসছে ।

বাবা হেসে বললাম,

বাইরের জিনিষ তো খেতেই চাই না কিন্তু বাড়ি ফিরবার পথে দেখলাম ওরা পুড়ি ভাজছে । থেকে থেকে পুড়িগুলো ফুলে উঠছে । কতগুলো আবার লালচে হয়ে উঠেছে আগুনের তাপে । তখন আর না কিনে পারলাম না ।

বাবা এমন ভাবে বললো যে আমি না হেসে পারলাম না ।

বাবা বললো, তোদের মাও খুব পুড়ি পছন্দ করতো । ও তো প্রায়ই নিয়ে আসতো বাসায় ।

- তখন তোমার বদ হজম হতো না?

বাবা বললেন,

না কারণ তখন আমার বয়স কম ছিলো তাই সব হজম করতে পারতাম আর তাছাড়া তখনকার খাদ্যে ভেজাল ছিল না । আমরা সব সময় ফ্রেস খেতাম । সত্যি কথা কি জানিস, তখনকার মানুষদের একটা নীতি ছিলো, ছিল খুদা ভীতি তাই খাদ্যে ভেজাল মেশাতে ওদের প্রাণ কাঁপতো । এখন সে সব উঠে গেছে ।

আমি বলালম, বেলটা খেয়ে কেমন লাগছে ?

- ভাল । পেটটা মনে হয় একটু ঠান্ডা হয়েছে ।

আরো এক গ্লাস দেবো?

- দে ।

আমি নিচে গিয়ে আরো এক গ্লাস নিয়ে এলাম । ওদিকে উকি মেরে দেখলাম খুশি ঘুমাচ্ছে । ওর ফ্যানের স্পিডটা কমিয়ে এলাম যেন বুকে ঠান্ডা না লাগে ।

বাবা বললেন, তোর কি তোদের মায়ের চেহারা মনে পড়ে ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম,

চেহারার চেয়ে মার হাতের কথা বেশি মনে পড়ে । মা হাত দিয়ে আমার টিফিন সাজিয়ে দিতেন । মা এতো শুকনো ছিল কেনো ?

- এটা ওদের বংশের ধারা । তোর নানা-মামাদের দেখ, কেমন শুকনা । তোরা দুই-বোনও সেই ধরন পেয়েছিস ।

- তোমার কাছে কিছু পাইনি?

- হু পেয়েছিস?

- কি?

- গাছ-পালা নিয়ে থাকা ।

আমি হেসে বললাম, সে তো খুশির চ্যাপ্টার ।

- তা ঠিক না । তোর মধ্যেও গাছ-পালা আছে কিন্তু সেটা কখনো পরখ করে দেখিসনি ।

- কিভাবে বুঝলে ?

- তোরা আমার মেয়ে তাই বুঝেছি ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ করে গেলাম । তাকিয়ে দেখলাম চাদের আলো ফিকে হয়ে আসছে ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, আজ আবার মার কথা জানতে চাইলে?

- আলমারি খুলতে গিয়ে দেখি তোর মার রুমাল । এই রুমালটা তোর মা এনেছিল বিয়ের সময় কিন্তু পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি । আজ এত বছর পর পেলাম ।

- কৈ দেখি ?

বাবা রুমালটা মেলে ধরলেন ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম সাদা কাপড়ের উপর কালো সুতোর কাজ । একটা বক দাঁড়িয়ে আছে অল্প পানিতে আর মাথার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ ।

বাবা বলতে লাগলেন,

- মৃত্যুর আগে তোদের মা শুধু বলতো, আমি মরে গেলে আমার হাসি-খুশিকে কে দেখবে? কে ওদের সকুলে নিয়ে যাবে? একটা কথা কি জানিস, সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ভালবাসার মানুষ । তোর হয়তো চিন-পরিচিত অনেকেই থাকবে, থাকবে বন্ধু-বান্ধব কিন্তু প্রয়োজনে দেখবি অনেকেই সরে পড়ছে কিন্তু

ভালবাসার মানুষ তা করবে না । মনের টানে সে এসে তোর পাশে দাঁড়াবে । তাই যখনি ভালবাসার মানুষ পাবি, তাকে আকড়ে ধরবি ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, আরো একটু খোলাসা করবে ব্যাপারটা ?

রায়হান সাহেব বলতে লাগলেন,

ধর, নামি-দামি হাসপাতালে ভর্তি হলি । সব নামি-দামি ডাক্তার তোর সেবা দিতে লাগলো । যখনি ডাক পড়ে, নার্সরা ছুটে আসে কিন্তু খেয়াল করে দেখবি কোথায় যেন আন্তরিকতার অভাব, কোথায় যেন ভালবাসা নেই । কিন্তু যখন একজন ভালবাসার মানুষ তোকে ছুলো, দেখবি শরীর-মন হালকা হয়ে গেছে । ভালবাসার এক পরশে সুস্থ্য হয়ে উঠবি ।

আমি বললাম, ভালবাসার মানুষ কই পাব বাবা?

রায়হান সাহেব অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

এসব পেতে ভাগ্য লাগে । তোদের ভালবাসার মানুষকে খুদা নিয়ে গেছেন । দোয়া করি উনি যেন সেটা পূরণ করেন ।

আমি বললাম, খুদা কি তোমার কথা শুনবে?

- সেটা জানিনা তবে উনি যে তোদের ভালবাসার মানুষকে নিয়ে গেছেন সেটা তার হিসেবে আছে আর এই হিসেবে থাকাটাই তোদের আশার কথা ।

বাবার কথাটা আমার ভাল লাগলো । আমি ভাবতে লাগলাম ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, আরো একটা উদাহরন দিতে পারবে ?

রায়হান সাহেব বলতে লাগলেন,

মানুষ মাত্রই ভালবাসা চায় আর চায় ভালবাসার মানুষ আর এটা মাথায় রেখেই জীবনচক্র সাজানো হয়েছে যেমন, প্রথমে আমরা বাবা-মার ভালবাসা পাব তারপর উনারা চলে গেলে পরিবারের ভালবাসা পাব । এভাবে ভালবাসা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকবো জীবনভর ।

- সেজন্য বুঝি ব্রোকেন-ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের মানুষ হতে কষ্ট হয় কারণ তারা পরিবারের ভালবাসা ঠিক মতন পায় না ?

-ঠিল তাই, বলে বাবা মাথা নাড়লেন ।

আমি চুপ হয়ে বাবার কথা শুনছি । এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানিনা, তাকিয়ে দেখি পূবের আকাশে আলো ছড়িয়ে পড়ছে । কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আজান দেবে । সূয্যি মামা ধরা দেবে আমাদের ধরাতলে ।

।। ৭ ।।

হাসি-খুশি এগ্রিকালচারার এন্টারপ্রাইজ

টিপু সুলতান রোডে বাবার মস্ত দোকান । বাসা থেকে হেঁটে গেলে পনের মিনিটের বেশি লাগবে না দোকানে যেতে । বাবা হেঁটেই যান, মাঝে-মধ্যে দেখি রিকশায় চড়ে বসে ।

তরি-তরকারি মাছ-মাংসের দোকান বাবার । সারাদিন কাস্টমার লেগে থাকে । কাঁচপুরে বাবার আট-বিঘার খামার । সেখানে হাস-মুরগি মাছ-মাংস, আর শাকসবজির চাষ হয় । আমাদের নামে বাবা ফার্ম করেছে, হাসি-খুশি এগ্রিকালচালার এন্টারপ্রাইজ । ফার্মের গেটে মস্ত বড় সাইনবোর্ডে লেখা আছে হাসি-খুশি এগ্রিকালচারার এন্টারপ্রাইজ কথাটা । এই ফার্ম থেকে প্রতিদিন মাছ-মুরগি, শাকসবজির এসে হাজির হয় বাবার দোকানে তারপর সারাদিন বিক্রি চলে ।

বাবার দোকানের সুনাম আছে সারা শহর জুড়ে কারণ বাবা কখনো ভেজাল মেশান না । ফ্রেস-তরতাজা মাছ-মাংস বিক্রি করেন বাবা, তাই দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে । যেসব জিনিষ উদ্বৃত্ত থাকে বা পচনের মুখে সেসব ফেলে দেয় আমাদের বাবা যেন তার খদ্দেররা বিশুদ্ধ খাদ্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে । স্থানীয় পত্রিকায় এ নিয়ে একটা আর্টিক্যাল বেরিয়েছিল । আর্টিক্যালের নাম ছিল, ভেজালমুক্ত লাভবান ব্যবসা । তারপর থেকে অনেকেই ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রিতে ঝুকে পড়েছেন । কোনভাবে যদি ক্রেতা বাড়ানো যায় সেক্ষেত্রে লাভ হবেই কিন্তু এর জন্য দরকার ক্রেতার আস্থা অর্জন ।

অনেকে ব্যবসায়ী মনে করেন দোকানের অখাদ্যটা যদি কোন ভাবে ক্রেতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায় তো আমি জিতে গেলাম কিন্তু উনি ভাবেন না যে ক্রেতাকে আজ অখাদ্য চাপালাম, তিনি কি আর এ মুখো হবেন? আধুনিক ব্যবসায়ের তত্ব হলো মূল ক্রেতাকে ধরে রাখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তার ছেলেপুলে, নাতি-নাতনিদেরও যেন ব্যবসাটা বংশ পরম্পরায় চালিয়ে নেওয়া যায় । কিন্তু এর জন্য দরকার উৎকৃষ্ট পণ্যটা ক্রেতার হাতে তুলে দেয়া যেন তিনি বার বার আসেন ।

বিদেশের চেইন-শপ গুলোতে তাই করা হয় । ওদের ডিসপ্লে তে সবচেয়ে ভাল জিনিষগুলো সাজিয়ে রাখা হয় যেন ক্রেতা অখাদ্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে না পারে । আমার বাবা অবশ্য এসব তত্বের কথা জানেন না । বাবা ভেজাল মেশান না কারণ তিনি ভেজাল মেশাতে পছন্দ করেন না । খুদার ভয়ে তার আত্মা কেঁপে উঠে ।

হাসি-খুশি এগ্রিকালচারার এন্টারপ্রাইজের সবচেয়ে বড় দিক হলো এই খামারের দক্ষিণে আমাদের মার কবর । ফার্মের দক্ষিণে মস্ত বড় বটগাছ আর সেই বটের ছায়ায় শুয়ে আছেন আমাদের মা । বটের হাওয়া দিনভর মাকে ছুঁয়ে যায় ।

মাঝে মাঝে আমরা বটতলায় এসে বসি মার সাথে । তখন দৃষ্টি চলে যায় সামনে পড়ে থাকা বিস্তীর্ণ ক্ষেত-খোলার দিকে । সেখানে কৃষকেরা হরেক রকমের চাষাবাদ করেছে । দুপুরের অলস বাতাস এসে পড়ে আমাদের গায়ে । আমরা তাকিয়ে থাকি যতদূর আমাদের দৃষ্টি পড়ে ।

মার কবরের জায়গাটা ঘেরা দেয়া হয়েছে কাঠের বেড়া দিয়ে যেন কোন জীবজন্তু ঢুকে না পড়তে পাড়ে । কবরের সাথের জায়গাটা সিমেন্ট দিয়ে বাধানো যেন আমরা মার পাশে বসতে পারি, মাকে সংগ দিতে পারি দিনভর । মাসের প্রথম শনিবার আমরা আসি মার কাছে কারণ মাসের প্রথম শনিবার আমাদের মা মারা যান । আসবার সময় পাটি, ঝাড়ু, খোনতা নিয়ে আসি যেন ঝোপ-ঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করতে পারি ।

প্রথমে মার কবরটা নিপুনভাবে ঝাড় দেই তারপর আগাছা কাটতে বসি । এসব ধলাই-মাজাই করতে ঘন্টা দুয়েক লেগে যায় তারপর কোরান-শরিফ খুলে বসি । ঘন্টা খানেক পড়ি, তখন বাবা আর খুশি অদূরে বসে থাকে । তারপর সন্ধ্যে নামলে বাসায় ফিরে আসি । পেছনে পড়ে থাকে আমাদের মা ।

হাসি-খুশি এগ্রিকালচারার এন্টারপ্রাইজ পরিষ্কার করবার লোক আছে । ওরা প্রতিদিন ঝার দেয় কিন্তু মার কবরের জায়গাটা আমরা কাউকে পরিষ্কার করতে দেই না । এটা আমরা পরিষ্কার করি আর আমাদের মা সেটা দেখেন প্রাণ ভরে ।

কবরের মাথায় কাঠের নেম প্লেট দেয়া আছে । ওখানে মার পুরো নাম কালো কালিতে লেখা আছে আর নিচে ছোট্ট করে সময়কাল । সপ্তাহ খানেকের মধ্যে লেখাটা হালকা হয়ে আসে রোদ-বৃষ্টির কারণে তাই প্রতিমাসে আমরা রং করি লেখাটা যেন হালকা না হয়ে আসে । এভাবে আমরা মাকে জীবিত রাখি ।

ইচ্ছে করলে আমরা মার্বেল পাথরে লিখতে পারতাম নেমপ্লেট টা, তাহলে বার বার লিখতে হতো না । কিন্তু ইচ্ছে করেই কাঠের নেমপ্লেটে লিখি যেন বার বার লিখতে পাড়ি আর এর মধ্যে দিয়ে মাকে জিইয়ে রাখি ।

একদিন খুশি এসে বললো,

আমার বাগানের একটা অংশ মার কবরের পাশে করতে চাই কারণ অনেক গাছের চাই অনেক আলো, অনেক হাওয়া । আমাদের ছাদে ঠিক এ্যাডজাস্ট করতে পারছে না ওরা ।

সাথে সাথে মত দিলেন বাবা । দেখতে দেখতে মার কবরের পাশে গড়ে উঠলো খুশির বাগান । বাড়ির গাড়ি করে গাছগুলো নিয়ে আসা হলো আমাদের ছাদ থেকে তারপর স্তরে স্তরে সাজানো হলো । কবরের পাশে জায়গাটা একদমি ফাঁকা আর সেখানে ইচ্ছে মতন বাগান সাজালো খুশি । এখন খুশির পরিধি আমাদের ছাদ থেকে বিস্তৃত হয়ে মার কাছে চলে এসেছে ।

।। ৮ ।।

নূতন গাছ

একবার খোঁজ এলো সিরাজগন্জের চরে নুতন গাছ দেখা গেছে । খুশি আর দেরি করলো না, হাসু চাচাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো । তিনদিন পরে ফিরে এলো ওরা, হাতে প্লাস্টিকের মোরকে গাছটা । কি খুশি আমাদের খুশি । বাবা এসে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন । নাম আর ট্যাগ দিয়ে গাছটা উঠে এলো খুশির বাগানে । এখন খুশি যোগাযোগ করবে লন্ডনের সাথে । খুশির চিঠি পেলে সাথে সাথে জবাব দেয় ওরা । খুশির আগ্রহ দেখে খুশির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে ওরা । প্রায় দেখি লন্ডন থেকে চিঠি আসে খুশির নামে ।

আমি দেখলাম, এ কদিনের রোদে খুশির চেহারা পাল্টে গেছে । ফস্রা ভাবটা মুছে রৌদ্রের দাগ পড়েছে কিন্তু কোথাও কোন ক্লান্ততা নেই ।

আমি বললাম, এ কদিন কই ছিলি?

খুশি বললো,

সিরাজগন্জ শহরের একটা হোটেলে । রেল স্টেশনের পাশেই হোটেলটা । ওখানে থেকে আমাদের অভিযান চলতো সিরাজগন্জের চরে । শহর থেকে চরে যেতে হয় নৌকায় । প্রথম দুদিন কোন সন্ধান পাইনি । তিন দিনের দিন পেয়ে যাই গাছটা ।

- কেমন লাগলো সিরাজগন্জ?

- খুব সুন্দর । যমুনার পাড়ে দাঁড়িয়ে, ছোটখাট ছিমছাম এলাকা ।

- আবার যেতে হবে ?

- না । ভাল মতন দেখে এসেছি । ওখানে আর নূতন গাছ নেই । যা আছে তা পুরোনো ।

- এটা যে নূতন কিভাবে বুঝলি?

- তা বোঝবার যো নেই এত তাড়াতাড়ি । আমাকে কদিন সময় দাও, একটু ঘাটাঘাটি করে দেখি । তবে যতদুর জানি এ গাছের সন্ধান কোথাও লেখা নেই ।

দুই সপ্তাহ পরে গাছের নমুনা পাঠানো হলো লন্ডনে । সপ্তাহ না ঘুরতেই জবাব এলো । এটা একদমি নূতন গাছ, এর সন্ধান ওদের খাতায় নেই । এর একটা বৈঙানিক নামও দিলো ওরা । খুশির নাম উঠে এলো ওদের খাতায় ।

কিছুদিন যেতে না যেতেই খুশির ডাক পড়লো লন্ডনে । টিকেট, ভিসা সব পাঠিয়েছে ওরা । সেদিন খুশির আনন্দ দেখে আমাদের প্রাণ ভরে এলো । সবাই মিলে হই-হুল্লোর শুরু করলাম । বাবা এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে তারপর আমরা চললাম চায়নিজ খেতে ।

বাবা খুশিকে বললেন, তুই হাসু মিয়াকে সাথে নিতে চাস, ?
- তাহলে তো খুব ভাল হয় কিন্তু ওর নামে তো টিকেট আসেনি ।
বাবা বললেন,

ওর টিকেটের ব্যবস্থা আমি করবো । তুই ওদের সাথে কথা বল । হাসু মিয়া না থাকলে তোর বন-বাদারে ঘোরা হতো না ।

খুব খুশি হলো খুশি । ও মনে মনে তাই চাইছিলো কিন্তু বাবাকে বলতে পারছিলো না । কখনো মুখ ফুটে নিজের ইচ্ছেগুলো বলবে না খুশি । আমাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে ওর ইচ্ছেগুলো ।

।। ৯।।

রায়হান সাহেবের জন্মদিন

সবাই মিলে ছবির বাগানে বসে আছি । ছুটি-ছাটার দিন বলে সবাই বসে চা-পানি খাচ্ছি । বার বার টোস্ট-বিস্কুট ভিজিয়ে দিচ্ছে বাবা চায়ের পানিতে । এই চা-টোস্ট ভিজিয়ে খাওয়া এনেছে হাসু চাচা আমাদের বাড়িতে তারপর থেকে আমরা রেগুলার খাই । সুযোগ পেলেই চা-টোস্ট নিয়ে বসি । টোস্ট ভিজিয়ে চা খাব মনে হতেই চায়ের তেষ্টাটা ধাই ধাই করে উঠে ।

হাসু চাচা আরো এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে বললো,

- সাহেব ।

- হ্যাঁ বলো, বাবা জবাব দিল ।

আব্বাকে হাসু চাচা সাহেব বলে ডাকে । আগে মনিব বলতো, বাবা অপছন্দ করাতে এখন সাহেব বলে ডাকে ।

- সবাই মিলে আপনার জন্মদিন করলে কেমন হয়? সামনের মাসে তো তারিখ পড়েছে ।

হঠাৎ এমন প্রস্তাব শুনে আমরা নড়ে বসলাম তবে প্রস্তাবটা আমাদের ভাল লাগতে লাগলো । বাবার জন্মদিন করা গেলে খুব ভালো হতো । কতদিন এ বাড়িতে অনুষ্ঠান হয় না ।

বাবা বললেন, কি বললে হাসু মিয়া ?

হাসু মিয়া বললো, সবাই মিলে আপনার জন্মদিন করলে কেমন হয় ?

- তুমি ঠিক বলছো তো হাসু মিয়া ?

হাসু চাচা মাথা নাড়লেন । বাবা হাসতে হাসতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ, তোদের হাসু চাচা কি বলে ?

আমি বাবার কথায় সায় না দিয়ে বললাম, অনুষ্ঠানটা হলে খারাপ হয় না । কতদিন আমরা অনুষ্ঠান করি না ।

আমার কথা শুনে বাবা চুপ হয়ে গেলেন । বুঝলেন ওদিকে পাল্লা ভাড়ি ।
আমি বললাম, খুশি, তুই কি বলিস?
খুশি কোন উত্তর দিল না কিন্তু অনুষ্ঠানটা হলে যে সে খুশি, সেটা স্পষ্ঠ হয়ে উঠলো ওর চেহারায় ।
বাবা বিপদে পড়ে গেলেন কারণ তাকিয়ে দেখলেন আমরা সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছি । সবাই চাচ্ছে অনুষ্ঠানটা হোক ।

বুড়িগঙা নদীতে একটা পুরোনো জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে । এখন আর চলে না, কতৃপক্ষ এর স্পেস ভাড়া দেয় অনুষ্ঠান করবার জন্য । আমরা জাহাজের সামনের দিকটা ভাড়া করলাম বাবার জন্মদিনের জন্য । কাছের কজন কাজিন আর পাড়া-পড়শিদের বলা হলো । ঠিক সকাল এগারটায় কেক কাটা হবে তারপরে দুপুরে খানা-পিনা । বিকেলে চা-বিস্কুট খেয়ে পার্টির সমাপ্তি ।

পার্টির দিন আমি ঘিয়া রংয়ের শাড়ি পড়লাম আর চোখে কাজল । এই কাজল দেয়াটা আমি মার কাছে শিখেছি । আমাদের মা সব সময় কাজল দিতেন ।

খুশি সালোয়ার কামিজ পড়েছে হালকা গোলাপী রংয়ের । আমি আর বাবা কিনে এনেছি জন্মদিন উপলক্ষে । হাসু চাচা আর বাবা সেরওয়ানি পড়লো । ওদেরকে খুব মানালো সাদা রংয়ের সেরোয়ানীতে । দেখে মনে হলো ভিনগ্রহের দুজন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

পার্টিতে দেখা হলো মামুন ভাইয়ের সাথে । আমাদের খালাতো ভাই, বিদেশী ব্যাংকে চাকরি করে, অনেক টাকা মাইনে পান । একজন ভদ্রলোকের যা যা থাকবার কথা, সব আছে মামুন ভাইয়ের । আমাদের বাবা খুব পছন্দ করেন মামুন ভাইকে, কোথাও দেখা হলে ডেকে আলাপ করেন । এখনো বিয়ে করেননি মামুন ভাই তবে পাত্রী দেখা চলছে ।
আমি বললাম, কেমন আছেন মামুন ভাই ? কতদিন পর দেখা । খালা ভাল তো ? কবে দেশে ফিরছে?
- সবাই ভাল । মা তো এবছর ফিরছে না, ইনশাল্লাহ আগামী বছর । তুমি?
- এই তো চলে যাচ্ছে পত্রিকা নিয়ে ।
- মাঝে মাঝে তোমার লেখা পড়ি । ভালই তো লেখো ।

আমি বললাম, কোন লেখাটা ভাল লেগেছে?

- ছাগল-ছানা নিয়ে লেখাটা, এই ছাগল-ছানা কৈ পেলে ?

- আমাদের খামারের ছাগল এটা । কিছুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল তারপর কদিন পরে পাওয়া যায় পাশের গাঁয়ে । সে সব ঘটনা নিয়ে লিখেছি গল্পটা ।

- ঘটনাাটা কি সত্যি ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

মামুন কিছু বললো না, চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, বাবার সাথে দেখা হয়েছে ?

- না । কৈ উনি?

আমি সামনের দিকটা দেখিয়ে দিলাম ।

- ঠিক আছে খালুর সাথে দেখা করে আসি । কেক কাটার টাইমটা যেন কখন?

- এগার টা ।

- ঠিক আছে পরে কথা হবে, এই বলে মামুন চলে গেল বাবার খোঁজে ।

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন মামুন ম্যাট্রিক দিয়েছে । খুব ভাল রেজাল্ট করলো মামুন । একদিন আমাদের বাসায় এসে বললো, হাসি, একটা মজার বই কিনেছি । ভাবলাম তোমার জন্য এক কপি নিয়ে যাই ।

আমি বললাম, কৈ দেখি ?

বইটা বাড়িয়ে দিল মামুন । বললো, আজ আর বসি না । তুমি বইটা পোড়ো, এই বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল ।

আমি দেখলাম আসলেই সুন্দর বইটা । কি সুন্দর ভাড়ি করে মলাট বেধেছে ওরা । ছবির প্রচ্ছদটা সবুজ রংয়ের, ডানদিকে ঝোপঝার আর উপরে রংধনু ।

আমি দেরি না করে পড়তে শুরু করলাম । পাঁচ-ছয় পাতা পড়বার পর দেখি বই থেকে একটা সাদা কাগজ গড়িয়ে পড়ছে । সাদা কাগজটা হাতে নিতেই দেখলাম একটা চিঠি । মামুন লিখেছে ।

হাসি,
প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি এই চিঠিটা লিখবার জন্য । আসলে আমার কিছু বলবার আছে, তাই লিখেছি । তোমাকে আমার ভাল লাগে কিন্তু কেন লাগে জানিনা । কাউকে ভাল লাগা কি অপরাধ? তুমি ভাল থেকো । ইতি মামুন

চিঠিটা বার বার পড়লাম কারণ এই প্রথম কোন প্রেম-পত্র হাতে এলো । চিঠিটা পড়ে কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগলো তারপর ওকে ভাজ করে রেখে দিয়েছি । চিঠির কোন জবাব দেই নি মামুনকে, মামুনও জানতে চায়নি । এরপর থেকে আমার সাথে দেখা হলে মামুন সরে যায়, আমার চোখের দিকে তাকাতে পাড়ে না । আজ এতবছর পর দেখা, তারপরেও মামুন মুখ লুকাচ্ছিল বারবার । উনি যে বিপদে পড়ে গেছেন, সেটা স্পষ্ঠ হয়ে উঠলো ।

সূর্য উঠেছে বুড়িগঙা জুড়ে আর বুড়িগঙার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে আমাদের জাহাজে । শীত আসতে বাকি নেই তাই শীতের আমেজ গায়ে পড়তে লাগলো । অনেকেই দেখলাম হালকা সোয়েটার চাপিয়েছে । এখন ঠান্ডা না লাগলেও রাতে যে সোয়েটার ছাড়া আসা যেত না সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো ।

যথাসময়ে কেক কাটা হলো । এক প্রস্ত হাত তালি পেলেন আমাদের বাবা । সব মিলিয়ে ত্রিশ জনের মতন অতিথি এসেছে । সবার সাথে হাত মিলিয়ে কথা বলতে লাগলো আমাদের বাবা ।

খুশি এসে বললো, আপি, কেক খাও ।
আমি হা করে কেক খেলাম । খুব মজার কেক করেছে ওরা ।
খুশি বললো, আপি, জায়গাটা কিন্তু দারুণ । আজ রাতে থাকা যাবে?
- না রে, বিকেলের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে । কেন তুই থাকতে চাস?
হাঁ-না কিছুই বললো না খুশি ।
আমি বললাম, কেক খেয়েছিস?
- না ।

- কেন ? এই বলে আমি ওকে নিয়ে চললাম কেক খাওয়াতে ।

পথে খুশি বললো, ওপাড়ে যাওয়া যায়, আপি ?

- হ্যাঁ । ঐ যে নৌকা দেখছিস ওদের বললে পার করে দেবে । কেন তুই যেতে চাস?

খুশি মাথা নাড়লো ।

- ঠিক আছে । আমি, তুই, বাবা আর হাসু চাচা নৌকায় পার হবো । যদি আজকের অনুষ্ঠান তাড়াতাড়ি শেষ হয় তো আজই পার হবো ।

খুশি মাথা নাড়লো । কিছু বললো না ।

এদিকে এসে দেখি আনিছ ভাই ডেকে দাঁড়িয়ে আছে । নদীর হাওয়ায় উনার বাবরি চুল উড়ছে এলো পাথারি । আমি বাবরির দিকে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না উনার চোখ আমার উপর এসে পড়ে ।

- এই যে হাসি, সব ভালো তো? কেক কিন্তু দারুণ হয়েছে । কৈ থেকে আনলে?

- হুপার ।

- ঠিক তাই অনুমান করেছিলাম । এদিকে দেখ, আকাশে আজ কয়েকটা গুড্ডি ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যি তাই । হরেক রংয়ের গুড্ডি পত পত করে উড়ছে আকাশে । নদীর পাড় থেকে ছেলে-পুলেরা উড়াচ্ছে ।

আমি বললাম, তোমার মাথা থেকে এখনো গুড্ডির ভুত নামলো না ?

আনিছ বললো, ভাবছি ভূত ছাড়াতে কবিরাজ দেখাবো ।

- যেটা করবে না সেটা বলছো কেন?

- সরি, আর বলবো না ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

।। ১০ ।।

মতিঝিল

হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এক সাথে পড়াতে লম্বা ছুটি পড়েছে । এত বড় ছুটি আমি কখনো দেখিনি । শহরের লোকজন দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি, অফিস-আদালত আটকিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে । পেছনে পড়ে আছে বড় বড় তালায় ঝুলে থাকা দালান-কোঠা । সাতদিন টানা বন্ধ থাকাতে শহর ঝিমিয়ে এলো । মানুষের পর মানুষ, গাড়ির পর গাড়ি আর নেই । মতিঝিলের মতন ব্যস্ত সড়ক কেমন ফাঁকা, মনে হয়ে শহর স্থানান্তর হয়ে অন্যত্র চলে গেছে ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশেই আমার অফিস । অফিস থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে করেই রিকশা নিলাম না । ভাবলাম মতিঝিলের নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, দেখি কেমন লাগে । এখান থেকে হাঁটা দিলে আমার বাড়ি পৌছতে চল্লিশ মিনিটের বেশি লাগবে না ।

সোজা হাঁটা দিয়েছি ফুটপাত দিয়ে । হাঁটবার আগে শাড়িটা গুজে নিয়েছি ভাল করে যেন হাঁটতে অসুবিধেয় পড়তে না হয় । কিছুটা হাঁটতেই দেখলাম আনিছ বেরুচ্ছে বায়ের গলি থেকে । সাদা-সার্ট আর ঘিয়া প্যান্ট পড়েছে ও । চিরা-চরিতো বাবরি ঝুলে আছে কানের পাশে, থেকে থেকে দুলছে ওগুলো ।

আমাকে বললো, এদিকে কোথায়?

আমি হেসে বললাম, বাসায় ফিরছি । আজ আর রিকশা নেইনি, হেঁটেই ফিরবো ।

আনিছ বললো,

আমি ইত্তেফাকে যাচ্ছি । ভালই হলো তোমার সাথে হাঁটা যাবে । চা-পানি কিছু খাবে ? পাশেই ঝিল রেস্তোরা ।

- না আজ আর খাই না । চলো হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি ।

আনিছ কিছু বললো না । আমার পাশে হাঁটতে লাগলো ।

আমি বললাম, তোমাদের বাড়ির সামনে খোড়াখুড়ি চলছে । দালান-কোঠা হবে নাকি?

আনিছ হেসে বললো,

এ আর নূতন কি? সারা-শহর জুড়েই তো খোড়াখুড়ি চলছে । একদিন দালান-কোঠায় ঢেকে যাবে আকাশ । তখন আকাশ দেখতে বুড়িগঙা যেতে হবে ।

আমি বললাম,

বুড়িগঙাও তো ভরে যাচ্ছে । ওখানে গড়ে উঠছে ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট আর আবাসিক পল্লী । তখন নদী বা আকাশ কোনটাই নজরে আসবে না ।

আনিছ কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম,

তুমি যাই বলো, আজকে কিন্তু দারুণ লাগছে । গাড়ি-ঘোড়া নেই, রাস্তা-ঘাট ফাঁকা । মনে হয় দিনভর ঘুরে বেড়াই । তোমাদের মতন ছেলে হলে আমি তাই করতাম ।

আনিছ হেসে দিল । অনেকক্ষণ হাসলো ও ।

আমি বললাম, হাসছো যে?

- না এমনি । খুব হাসি পাচ্ছে তোমার কথা শুনে । আমারও মনে হচ্ছে তোমার সাথে ঘুরে বেড়াই ।

আমি বললাম,

নীল আকাশের নীচে ফিল্মটা দেখলাম সেদিন । অনেক পুরোনো ফিল্ম । সিনেমার নায়ক ঢাকার রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ফেরে । তখন যে ঢাকা কত হালকা ছিল, সিনেমা না দেখলে বিশ্বেস হতো না ।

- সিনেমাটা একটু দিও তো । শুধুমাত্র গাড়ি-ঘোড়া মুক্ত ঢাকা দেখতে কেমন হবে, সেটা দেখতেই সিনেমাটা দেখবো ।

আমি হেসে দিলাম । বললাম, কালই পেয়ে যাবে, হাসু চাচাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

এভাবে হাঁটতে হাঁটতে মধুমিতার কাছে চলে এসেছি । রাস্তার ওপারে স্টক এক্সচেন্জ ।

আনিছ বললো, ছুটির সাতদিন কেমন কাটালে ?

- পত্রিকার লোকদের ছুটিছাটা নেই আবার সব সময় ছুটি । এই যে স্বাধীনতা, সেটাই সবচেয়ে ভাল লাগে ।

- তো.....তোমার শিশু-সাহিত্য কেমন চলছে ?

- এইতো চলে যাচ্ছে ।

- বড় কিছু লিখবে নাকি?

আমি বললাম,

সে রকম কোন প্ল্যান নেই তবে বাচ্চাদের সময় দিতে চাচ্ছি । যে সব শিশু-কিশোররা আমাকে লেখা পাঠায়, তাদের একটা অংশ অনেক ভাল করবে যদি চর্চা চালিয়ে যায় । আমার কাজ হলো সে সব শিশুদের সাথে যোগাযোগ রাখা যেন তারা চর্চাটা চালিয়ে যেতে পারে ।

আনিছ হেসে বললো, ওরা বড় হলে আমাদের খুশির মতন হবে ?

- ঠিক তাই, এই বলে আমি হেসে দিলাম । বললাম,

পড়া-পড়া করে পাগল মেয়েটা । ইমপেরিয়াল কলেজের এক প্রফেসারের সাথে ওর খাতির । ঐ প্রফেসারও গাছ পাগল । নিয়মিত ওরা যোগাযোগ রাখে ।

আনিছ বললো, খুশি চাইলে অনেক বড় হতে পারবে । বলা যায় না ক্যানসারের ঔষধ পেয়ে যেতে পারে মেয়েটা ।

আমি চুপ থেকে বললাম, ওকে যে পেতেই হবে আনিছ ভাই ।

আনিছ বললো, তোমাদের ডোনেশন এর পাশাপাশি খুশির বাগান একাউন্টে আমি কিছু ডোনেট করতে চাই, কি বলো?

আমি খুশি হয়ে গেলাম । বললাম, You are most welcome.

- তাহলে দশ হাজার টাকার চেক নিয়ে আসছি ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । কিছু বললাম না ।

দেখতে দেখতে ইত্তেফাকের সামনে চলে এসেছি ।

আনিছ বললো, আমি যাই ।

- এসো, বলে সরে দাঁড়ালাম ।

তাকিয়ে দেখলাম আনিছ হেঁটে যাচ্ছে ইত্তেফাকের দিকে আর থেকে থেকে দুলছে ওর বাবরিটা । আমি তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না ওর বাবরিটা আড়াল হয়ে যায় ।

।। ১১ ।।

স্কলারশিপ

এখন দিনভর আমাদের দৌড়ঝাপ কারণ ঈদ-সংখ্যা শিশু-কিশোর পাতা বের হচ্ছে আর তাই নিয়ে আমাদের তোড়জোড় । বড় সম্পাদকের হুকুম পনের তারিখের মধ্যে সব জমা দিতে হবে । আমরা আদা-জল খেয়ে লেগেছি । ঈদ সংখ্যা বের হবে বলে বাচ্চারা অনেক লেখা পাঠিয়েছে । সেগুলো বাছাই-মাজাই করতে করতে বেলা পড়ে আসে ।

বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা । বাসায় ঢুকতে মাগরিবের আজান দিল । টিপু সুলতান রোড থেকে ভেসে আসছে আজান । হাত মুখ ধুয়ে নামাজ পড়ে নিলাম তারপর এলোপাথারি শুয়ে পড়েছি । আজ সারাদিন ধকল গেছে তাই ঘুমিয়ে পড়তে সময় নিলো না ।

ঝাড়া ঘন্টা দেড়েক ঘুমিয়ে উঠেছি, এখন ফ্রেস লাগছে । এদিকে এশার ওয়াক্ত হয়ে হলো । ভাবলাম পরে পড়ি । এশা নামাজের সুবিধে হলো, এই নামাজের সময়টা গভীর রাত পর্যন্ত থাকে তাই ব্যতিব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন দেখছি না ।

বিছানা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছি । বসার ঘরে কারা যেন গল্প করছে, খুব পরিচিত লাগছে গলাটা । একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি বাবা আমার রুমের দিকে আসছে ।

- এই হাসি শুন ।
- বলো ।
- আনিছ এসেছে । চা-পানির ব্যবস্থা কর ।
- আচ্ছা করছি, এই বলে উঁকি দিয়ে দেখলাম আনিছ বসে আছে মাথা নিচু করে । টেলিভিশন দেখছে ও । এই রাত-বিরেতে ছেলেটা কেন এলো বুঝলাম না ।

চা বানিয়ে ড্রইংরুমে এসেছি ।

বললাম, কি ব্যাপার আনিছ ভাই, খবর ভাল তো ?

আনিছ উঠে দাঁড়িয়েছে । হু ভাল, একটা খবর দিতে এলাম ।

হেসে বললাম, ঠিক আছে পরে শুনি, আগে চা-পিঠা খাও ।

আনিছ এলিয়ে বসলো সোফায় । খেতে শুরু করলো পিঠা ।

- কেমন হয়েছে পিঠা?

- দারুণ । তুমি বানিয়েছ?

- মোটেই না । দেশ থেকে এসেছে ।

দেখতে দেখতে সবগুলিই খেয়ে ফেললো আনিছ তারপর ইতস্তত করছে ।

আমি বললাম, আরো খেতে চাও?

আনিছ হেসে দিল । বুঝলাম আপত্তি নাই ।

অন্য কেউ হলে আনিছ চুপ থাকতো কিন্তু আমার সামনে ওসবের ধার ধারলো না ।

আমি গিয়ে আরো দুটো নিয়ে এলাম ।

- তোমাকে ধন্যবাদ হাসি । আসলেই তুমি ভাল ।

- আমি ভাল সেটা আমি জানি, এই বলে হেসে দিলাম ।

আনিছ চা তুলে নিয়েছে । চায়ের ভেতর পিঠা ডুবিয়ে খেতে লাগলো । ও চা খাচ্ছে আর থেকে থেকে ওর বাবরি দুলছে । ওর বাবরি আরো লম্বা হয়েছে, কান থেকে তিন ইন্চির মতন ঝুলে গেছে । কেমন বাউল বাউল লাগে, আবার মনে হয় অনেক ঙাণী ।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, আমার স্কলারশিপ জুটেছে । সেপ্টেম্বরে ক্লাস, চলে যাচ্ছি ।

সত্যি সত্যি আমি খুশি হয়ে গেলাম । দাঁড়িয়ে বললাম, আমি জানতাম তোমার হবে । দারুণ একটা খবর, চায়নিজ খাওয়াতে হবে ।

- আলবত খাওয়াবো । কবে খাবে বলো ?

আমি হেসে বললাম, কত বছরের জন্য যাচ্ছ?

- পিএইচডি প্রগাম, তিন-চার বছরের নিচে না ।

- কোন ইউনিভার্সিটিতে ?

- লন্ডন ইউনিভার্সিটির কথা লিখেছে ওরা ।

- তাহলে তো খুব ভাল । তুমি তো বরাবরি লন্ডনে পড়তে চাচ্ছিলে ।

- ঠিক তাই, এই বলে আনিছ হেসে দিল ।

একটু থেমে বললাম, পিএইচডি করে দেশে সেটল করবে না লন্ডনে কোথাও গবেষণা করে কাটাবে ?

- এখনো ঠিক করিনি । দেশেও তো চাকরি আছে । আমার ইচ্ছে দেশে ফিরে কিছুদিন মাস্টারি করি তারপর কোন বিদেশী প্রফেসরের আন্ডারে গবেষণা করবো কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা । এখন পিএইচডি করবো সেটাই আগে ।

আমি বললাম, বিয়ে-শাদি করে যাচ্ছ?

আনিছ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, সে রকমি ইচ্ছে, বাবা-মাও তাই বলছে ।

- কি ধরনের মেয়ে তোমার পছন্দ ?

আনিছ কোন উত্তর দিল না ।

আমি বললাম, পড়ুয়া মেয়ে চাই তোমার, ঠিক ?

আনিছ হেসে দিল । বুঝলাম আমার কথা ভাল লেগেছে ওর ।

ওদিকে না গিয়ে আনিছ বললো,

এখন উঠি, রাত অনেক হলো, যাবার আগে আবার আসবো । তোমাদের কথা মনে থাকবে ।

আমি হেসে দিলাম, কিছু বললাম না ।

।। ১২ ।।

নূতন খুশি

সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নামাজ পড়ে নিলাম । তখনো আলো ফুটেনি, সূয্যি মামা এসে পড়েননি পৃথীবির পরে । তর তর করে সিরি বেয়ে খুশির বাগানে উঠে এসেছি । ছাদে গিয়ে দেখালাম কাঠের চেয়ারে শিশির পড়ে আছে আর এরি এক কোনে খুশি বসে আছে । এই সাত-সকালে ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম ।

আমি বললাম, এই সাত-সকালে এখানে কি করছিস? রাতে ঘুমাসনি?

খুশি কিছু বললো না । আমি জানি ও মুখ ফুটে বলবে না । আমাকেই বের করতে হবে কথাটা ।

আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে বললাম, শরীর খারাপ?

- না আপি ।

- তাহলে?

- শুনলাম আনিছ ভাই চলে যাচ্ছে তাই মন খারাপ ।

আমি বললাম,

এতে মন খারাপ করবার কি আছে ? আনিছ তো আবার ফিরে আসবে অনেক বড় বৈঙানিক হয়ে । ঠিক?

আমার কথায় আস্বস্ত হলো না খুশি । বেজার ভারটা থেকেই গেল ।

আমি বললাম, এবার হয়েছো তো?

- না, হয়নি ।

- কেন ?

- কারণ আনিছ ভাইকে আমার ভাল লাগে । উনি চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে ।

খুশির কথা শুনে তো আমি অবাক । এই প্রথম আমরা শুনলাম খুশির কোন ছেলেকে ভাল লাগে । সম্ভবত এটাই খুশির মুখ ফুটে বলা কোন আবদার ।

আমি বললাম, সত্যি বলছিস তো ?

- হু । সত্যি বলছি ।

- আনিছকে তোর কেন ভাল লাগে ?

- উনি যে দিন-রাত পড়েন তাই ।

- আনিছকে বিয়ে করতে চাস?

খুশি কিছু বললো না । আমার গলা জড়িয়ে ধরলো ।

আনিছকে গিয়ে আমি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিলাম । আনিছ অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রইলো । বললো, এ প্রস্তাব কি তোমার পরিবারের পক্ষ থেকে?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- খুশির মতামত নিয়েছ ?

আমি এবারও মাথা নাড়লাম ।

আনিছ আবারও চুপ হয়ে গেল । বললো, কদিন সময় দাও, তোমাকে পরে জানাবো ।

- ঠিক আছে, তুমি ভেবে আমাকে জানিও । আজ চলি ।

আনিছ-খুশির বিয়ে হয়ে গেল অল্প কদিনের নোটিশে । এই অল্প সময়ে যেটুকু করা যায় আমরা করলাম ।

আনিছ বললো, ও সাজু-গুজু করে বর বেশে আসবে না ফলে বরের জন্য আলাদা কোন স্টেজ বানানো হলো না । আনিছ এলো স্যুট পড়ে বিয়ে অনুষ্ঠানে, বসলো সবার পাশে সামনের সারিতে । অনেকেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, অনেকে আবার প্রশংসা করলো । হতাশ হলো বেয়ারা-বাবুর্চিরা যারা স্টেজে বসা বরের কাছে কিছু আদায় করতে পারে । আমাদের অন্চলে বরের জুতো চুরির একটা ব্যাপার চালু আছে, সেটা ঘটলো না এবার ।

সকালে কাজি সাহেব বিয়ে পড়িয়ে গেছেন তাই বর-পক্ষ আসার পরেই শুরু হলো খানা-পিনা ।

টিপু সুলতান রোডের মোড়ে তুলসি ধর কমিউনিটি সেন্টার । পাঁচ-ছশো লোক অনায়েসে খেতে পারে । ওখানে আয়োজন হলো বিয়ের । এই তুলিস ধর সম্ভবত ব্রিটিশ আমলের লোক । পেশায় ছিলেন যাযাবর, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন । সম্ভবত এই কমিউনিটি সেন্টারটা আগে স্কুল ছিল । ভদ্রলোক মারা যাবার পর সকুল ভেঙে কমিউনিটি সেন্টার করা হয়েছে । উনার ছেলে পুলেরা এখনো আছে, ওয়ারির শেষ মাথায় ওদের বাসা ।

খুশি বিদায়ের সময় বাবা অনেক কাঁদলেন । বাড়ি শুদ্ধ সবার মন ভার হয়ে এলো । অনেকে দেখি একটুতেই কাঁদে । আমার সহজে কান্না আসে না এখন কারণ মার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার কান্না ফুরিয়ে গেছে । এখন শুধু আমি হাসি । কাউকে কাঁদতে দেখলে তার পাশে এসে বসি । এক সময় দেখি কান্না থেমে গেছে । তখন আস্তে আস্তে উঠে আসি সে জায়গা থেকে ।

বিয়ের রাতে খুশি বললো,

আমি আনিছকে বলবো লন্ডনে মস্ত বড় বাড়ি ভাড়া নিতে যেন আমি, তুমি, বাবা আর হাসু চাচা এক সাথে থাকতে পারি ।

আমি হেসে বললাম, ঠিক আছে বলিস ।

- হ্যাঁ আরো একটা কথা, যদি কখনো ক্যানসারের ঔষধ আবিস্কার করতে পারি, ওর নাম দেবো হাসি ।

আমি আবারও হেসে দিলাম । বললাম, ঠিক আছে রাখিস ।

।। ১৩ ।।

লন্ডন

খুশি-আনিছ এখন লন্ডনে থাকে । ওদের বাড়ি থেকে বাসে উঠলে আধ-ঘন্টায় পৌছানো যায় লন্ডন ইউনিভার্সিটি । খুশির গবেষণা কর্ম দেখে লন্ডনের এক ইউনিভার্সিটি ওকে চাকরি দিয়েছে । Plant Anatomy পড়ায় খুশি । লেকচার দেবার পাশাপাশি ওর গবেষণা চলে । এরি মধ্যে একবার Borneo ঘুরে এসেছে ও । ওর Team এ আছে হাসু চাচা আর কয়েকজন ছাত্রী । ওরা অনেক গাছ-গাছালি সংগ্রহ করে এনেছে, এখন সে সব নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলে । ঠিক কোন গাছ থেকে ক্যানসারের প্রতিষেধক পাওয়া যাবে, তা নিয়ে ওদের দৌড়ঝাপ ।

মাস চারেক আগে ওদের ফুরফুরে একটা মেয়ে হয়েছে । খুশি ফোন করে বললো, আপি, মেয়ের নাম কি দেবো ?

আমি চুপ করে থেকে বললাম, আয়েশা ।

- বাহ খুব সুন্দর নাম তো । এটাই আমি রাখবো ।

আমি বললাম, আনিছের সাথে কথা বলে নাম রাখিস ।

- ঠিক আছে, তাই হবে ।

আমি বললাম, তোর কিছু খেতে ইচ্ছে করে ?

- ইয়েস । তোর হাতের পায়েশ কিন্তু সাত-সমুদ্র পেরিয়ে এসবের পাঠানোর দরকার নেই । আমি আসবো তোর পায়েশ খেতে ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

আরেকদিন ফোন করে বললো, আপি, কি করি বলতো?

আমি বললাম, কি হয়েছে?

- রাতভর বাবু জেগে থাকে আর খস খস শব্দ করে ।

আমি বললাম, নূতন পৃথীবিতে এসেছে তাই এ্যাডজাস্ট করতে সময় নিচ্ছে । কিছুদিন পর দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে ।

খুশি বললো, আমরাও কি ছোট-বেলায় এরকম ছিলাম?

- তাই তো মনে হয় ।

খুশি কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, টিকা দিচ্ছিস তো ঠিক মতন ?

- হু শুরু হয়েছে । চলবে দুই বছর ধরে । আমাদের সময় কি এতো টিকা ছিল ?

আমি বললাম,

না । আমাদের সময় হাতে গোনা কটা টিকা ছিল, এখন তো দেখি টিকার লম্বা লিস্ট ।

খুশি চুপ করে গেল । কিছু বললো না ।

আমি বললাম, দেশে আসছিস কবে ? বাবুটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে ।

- নেক্সট ইয়ার । দু-মাসের ছুটি নিয়ে আসবো ।

- ঠিক আছে, তখন পায়েশ রাধবো ।

খুশি একটু পরে বললো, আমার বাগানের অবস্থা কি ?

- বাগান আগের মতন আছে । আমি আর বাবা ধুয়ে-মুছে রাখি ।

- আপি?

- বল ।

- তোদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে ।

খুশির অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন । আগে যেমন কোনায় কোনায় পড়ে থাকতো, কেউ না সাধলে কথা বলতো না, এখন সে সব থেকে বেরিয়ে এসেছে ও । আমাকে প্রায়ই ফোন করে । লন্ডনের গল্প বলে, মেয়ের কথা বলে । কোথাও ঘুরতে গেলে সে সব বিস্তারিত বলে । আসছে মাসে ওরা সুইজারল্যান্ড যাবে, ট্রেনের বুকিং দিয়েছে আনিছ । জেনেভা থেকে সোজা জুরিখ যাবে তারপর ফিরে আসবে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে । ফিরে এসে লম্বা গল্প দেবে । আমাকে না বলে ও শান্তি পায় না ।

এখন খুশির কর্মকান্ড অনেক । স্বামী আর মেয়েকে সামাল দিতে হয় কিন্তু তাই বলে ক্যানসারের পিছ ছাড়েনি ও । দিন-রাত চেষ্টা চলে । এদিকে আমি আর বাবা বসে আছি আমাদের ব্যক্তিগত শত্রু ক্যানসারের থাবা রুখে দিতে । ওকে রুখতে না পারলে যে আমাদের মতন কোটি কোটি শিশু-কিশোরদের অসহায়ত্বের মধ্যে পড়তে হবে । অপূর্ণভাবে বেড়ে উঠবে ওরা তারপর হারিয়ে যাবে অনেক মৌলিক বৈশিষ্ঠ ওদের চরিত্র থেকে ।

হাসু চাচা আর খুশি নেই কিন্তু আমি আর বাবা মিলে খুশির বাগান ধুয়ে মুছে রাখি । মাঝে মাঝে গাছগুলোর পাতা ছেটে দেই । সপ্তাহে দুদিন বাবা ছাদের মেঝেটা সাফ করে । আমি দাঁড়িয়ে পানি-সাবান সাপ্লাই দেই ।

বাগান পরিষ্কার হয়ে গেলে বাবা চা নিয়ে বসেন । আমি বসি টোস্ট বিস্কুট নিয়ে । গরম চায়ের মধ্যে টোস্ট ডুবিয়ে দেন বাবা তারপর টোস্টটা নরম হলে ঝটাপট খেয়ে ফেলেন । বাবার এই টোস্ট খাওয়া দেখতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, তাই যখনি বাবা চা-টোস্ট নিয়ে বসেছে, আমি এসে পাশে বসেছি ।

মাঝে মাঝে আমি আর বাবা মিলে আসর বসাই খুশির বাগানে কিন্তু হাসু চাচা আর খুশি না থাকাতে তেমন জমে না । কিছুক্ষণ পরে আমরা নিচে নেমে আসি । বাবা এসে বলেন, হাসি, একটু মাথা টিপে দে তো, কেমন চিন চিন করছে । আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেই । আস্তে আস্তে বাবা ঘুমিয়ে পড়েন ।

অস্পষ্টতার পথে

মাঝে মাঝে খুব এলোমেলো হয়ে যাই । বাবা এসে পাশে বসেন ।

- হাসি বাদাম খাবি?

- দাও ।

বাদাম বাড়িয়ে দেয় বাবা ।

- হাসি, যাবি কোথাও ঘুরতে ?

- চলো, আমি ঘাড় নেড়ে সায় দেই ।

- টেকনাফে যাবার খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছে ওরা । সাতদিন থেকে আসি, যাবি?

আমি মাথা নেড়ে সায় দেই ।

- যাবার আগে তোর মার কবর জিয়ারত করে যাব । ওর খুব সখ ছিলো টেকনাফ দেখবার কিন্তু যাওয়া হয়নি । যাবার আগে অসুখে পড়লো ও । হ্যাঁ, আরও একটা কথা ।

আমি বললাম, বলো ।

- রাত-বিরেতে ছাদে গিয়ে কাঁদবি না?

আমি বললাম, এসব কি বলছো ?

- আমি জানিরে মা, আমি সব জানি, এই বলে বাবা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন ।

শিশুর মতন করে কাঁদছে বাবা । আমি দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ তারপর ধীরে ধীরে বাবার পাশে গিয়ে বসলাম । শক্ত হাতে বাবার হাত জড়িয়ে ধরেছি । তাকিয়ে দেখলাম আমার আঙুলগুলো থর থর কাঁপছে ।

শেষ

Please comment about the book to me at: sayed.hossain@yahoo.com
Please visit my personal website: www.sayedhossain.com